দ্বিতীয় ভাগ

সহজ পাঠ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অলংকরণ   নন্দলাল বসু

"Neither this book nor any keys, hints, comments, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977."

सत्यमेव जयते

বিদ্যালয়-শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এই পুস্তক অনুমোদিত বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

*** বিক্রয়যোগ্য নয় ***

বিদ্যালয়-শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, কলকাতা- ৯১ কর্তৃক প্রকাশিত

সংশোধিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১২
সংশোধিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩
সংশোধিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

সহজ পাঠ - দ্বিতীয় ভাগ

পর্ষদের কথা

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি.কে ৭/১, সেক্টর- ২, বিধান নগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬৯ সনের জানুয়ারি মাস থেকে প্রথম এ দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা বই বিনামূল্যে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে রবীন্দ্রনাথ রচিত সহজ পাঠ—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। এ—বিষয়ে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রসঙ্গত, ১. কিশলয় দ্বিতীয় শ্রেণিতে নির্দিষ্ট বর্ণপরিচয়ের পরে এই বইটি পঠনীয়। ২. এই বই—এ কোনো কোনো শব্দের প্রথমে আঁকড়িযুক্ত এ—কার (ে) বসিয়ে একটি বিশেষ উচ্চারণ বোঝানো হয়েছে। যেমন, দেয় (দ্যায়), খেলা (খ্যালা), দেখা (দ্যাখা)। ৩. বানান ইত্যাদি বিষয়ে কিছু সংশোধন করা হয়েছে এই বইটিতে।

'সহজ পাঠ' দ্বিতীয় ভাগ বইটির আকার, বিন্যাস এবং উপস্থাপনায় 'বিশ্বভারতী' সংস্করণকে হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে। কোথাও কোনো বিকৃতি ঘটানো হয়নি। মনে রাখতে হবে, বর্তমান বিশ্বভারতী সংস্করণটি রবীন্দ্র পরিকল্পিত অবয়ব। সার্ধশতবর্ষ পূর্তির কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিকল্পিত অবয়বে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে আমরা এই মহামতি স্রষ্টাকে প্রণাম জানাচ্ছি।

আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের অগণিত শিক্ষার্থী এই বই ব্যবহার করে উপকৃত হবে।

মানিক ভট্টাচার্য

সভাপতি

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রথম পাঠ

বাদল করেছে। মেঘের রং ঘন নীল। ঢং ঢং ক'রে নটা বাজল। বংশু ছাতা মাথায় কোথায় যাবে? ও যাবে সংসার-বাবুর বাসায়। সেখানে কংস-বধের অভিনয় হবে। আজ মহারাজ হংসরাজ সিংহ আসবেন। কংস-বধ অভিনয় তাঁকে দেখাবে। বাংলাদেশে তাঁর বাড়ি নয়।

তিনি পাংশুপুরের রাজা। সংসার-বাবু তাঁরই সংসারে কাজ করেন। কাংলা, তুই বুঝি সংসার-বাবুর বাসায় চলেছিস? সেখানে কংস-বধে সং সাজতে হবে। কাংলা, তোর ঝুড়িতে কী? ঝুড়িতে আছে পালং শাক, পিড়িং শাক, ট্যাংরা মাছ, চিংড়ি মাছ। সংসার-বাবুর মা চেয়েছেন।

দ্বিতীয় পাঠ

আজ আদ্যনাথ-বাবুর কন্যার বিয়ে— তাঁর এই শল্যপুরের বাড়িতে। কন্যার নাম শ্যামা। বরের নাম বৈদ্যনাথ। বরের বাড়ি অহল্যাপাড়ায়। তিনি আর তাঁর ভাই সৌম্য পাটের ব্যাবসা করেন। তাঁর এক ভাই ধৌম্যনাথ কলেজে পড়ে আর রম্যনাথ ইস্কুলে।

আদ্যনাথ বড়ো ভালো লোক। দান-ধ্যান, পুণ্য কাজে তাঁর মন। দেশের জন্য অনেক কাজ করেন। সবাই বলে, তিনি ধন্য। আদ্যনাথ-বাবু তাঁর ভৃত্য সত্যকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমি বলেছি, তাঁর কন্যার বিবাহে অবশ্য অবশ্য যাব। এখানে এসে দেখি, আঙিনায় বাদ্য বাজছে। চাষিরা এ বৎসর ভালো শস্য পেয়েছে। তাই তারা ভিড় করে এসেছে। ভিতরে ঢুকি সাধ্য কী। অগত্যা বাইরে বসে আছি। দেখছি ছেলেরা খুশি হয়ে নৃত্য করছে। কেউ বা ব্যাটবল খেলছে। নিত্যশরণ ওদের ক্যাপটেন।

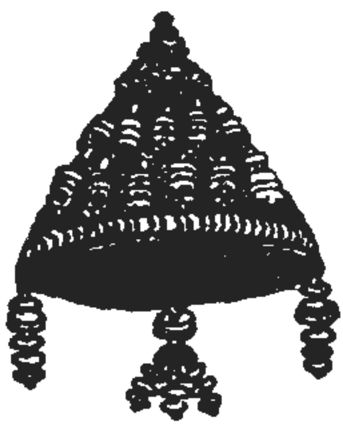

হাট

কুমোর-পাড়ার গোরুর গাড়ি—
বোঝাই-করা কলশি-হাঁড়ি।
গাড়ি চালায় বংশীবদন,
সঙ্গে-যে যায় ভাগ্নে মদন।
হাট বসেছে শুক্রবারে
বক্‌শিগঞ্জে পদ্মাপারে।

জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে
গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।
উচ্ছে বেগুন পটল মুলো,
বেতের বোনা ধামা কুলো,
সর্ষে ছোলা ময়দা আটা,
শীতের র‍্যাপার নকশাকাটা,
ঝাঁঝরি কড়া বেড়ি হাতা,
শহর থেকে সস্তা ছাতা।
কলশি ভরা এখো গুড়ে
মাছি যত বেড়ায় উড়ে।
খড়ের আঁটি নৌকো বেয়ে
আনল ঘাটে চাষির মেয়ে।
অন্ধ কানাই পথের ’পরে
গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে।
পাড়ার ছেলে স্নানের ঘাটে
জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে॥

তৃতীয় পাঠ

আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন। সব ছেলেরা দঙ্গল বেঁধে যাবে। রঙ্গলাল-বাবুও এখনি আসবেন। আর আসবেন তাঁর দাদা বঙ্গ-বাবু। সিঙ্গি, তুমি দৌড়ে যাও তো। অনঙ্গদাদাকে ধরো, মোটর-গাড়িতে তাঁদের আনবেন। সঙ্গে নিতে হবে কুড়ুল,

কোদাল, ঝাঁটা, ঝুড়ি। আর নেব ভিঙ্গি মেথরকে। এবার পঙ্গপাল এসে বড়ো ক্ষতি করেছে। ক্ষিতি-বাবুর খেতে একটি ঘাস নেই। অক্ষয়-বাবুর বাগানে কপির

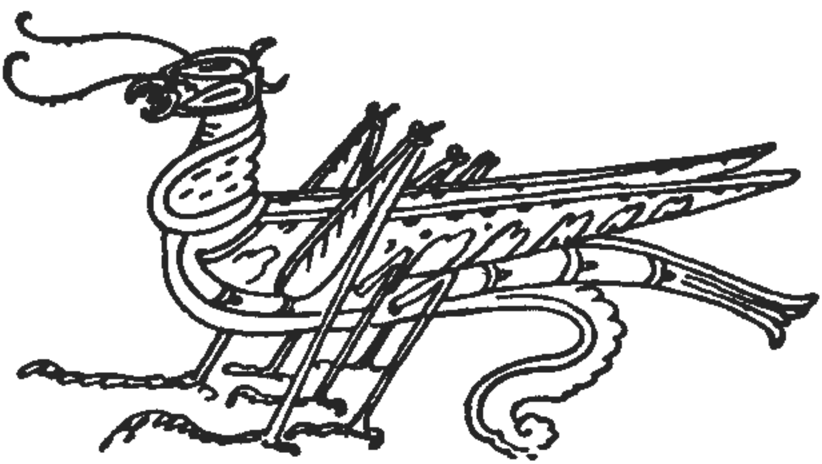

পাতাগুলো খেয়ে সাঙ্গা ক'রে দিয়েছে। পঙ্গপাল না তাড়াতে পারলে এবার কাজে ভঙ্গ দিতে হবে। ঈশান-বাবু ইঙ্গিতে বলেছেন, তিনি কিছু দান করবেন।

চতুর্থ পাঠ

চন্দননগর থেকে আনন্দ-বাবু আসবেন। তিনি আমার পাড়ার কাজ দেখতে চান। দেখো, যেন নিন্দা না হয়। ইন্দুকে বলে দিয়ো, তাঁর আতিথ্যে যেন খুঁত না থাকে। তাঁর ঘরে সুন্দর দেখে ফুলদানি রেখো। তাতে কুন্দফুল থাকবে আর আকন্দ থাকবে। রঙ্গু বেহারাকে বোলো,

তাঁর শোবার ঘরে তাঁর তোরঙ্গ যেন রাখে। ঘর বন্ধ যেন না থাকে। সন্ধ্যা হলে ঘরে ধুনোর গন্ধ দিয়ো। দীনবন্ধুকে রেখো পাশের ঘরেই। তাঁদের সঙ্গে সিন্ধু-বাবু আসবেন, তাঁকে অন্য ঘরে রাখতে হবে। বিন্দুকে বলে মালাচন্দন তৈরি রাখা চাই। বন্দেমাতরম্ গান নন্দী জানে তো? সেই অন্ধ গায়ককেও ডেকে এনো। সে তো মন্দ গায় না।

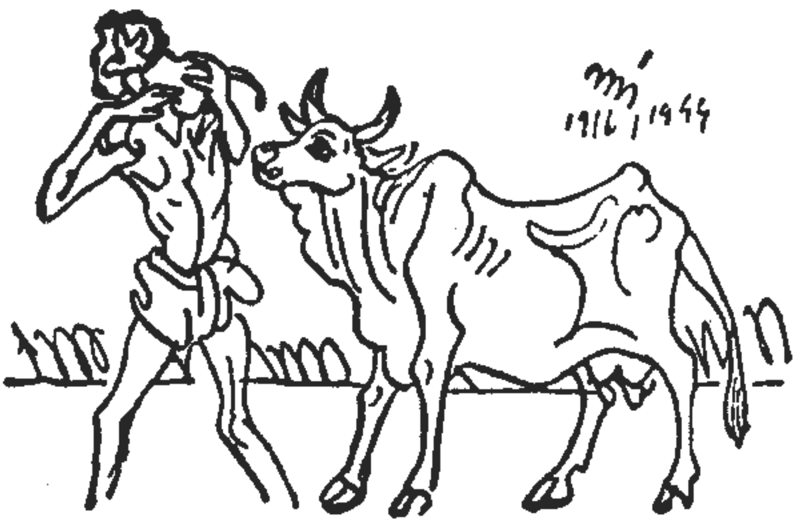

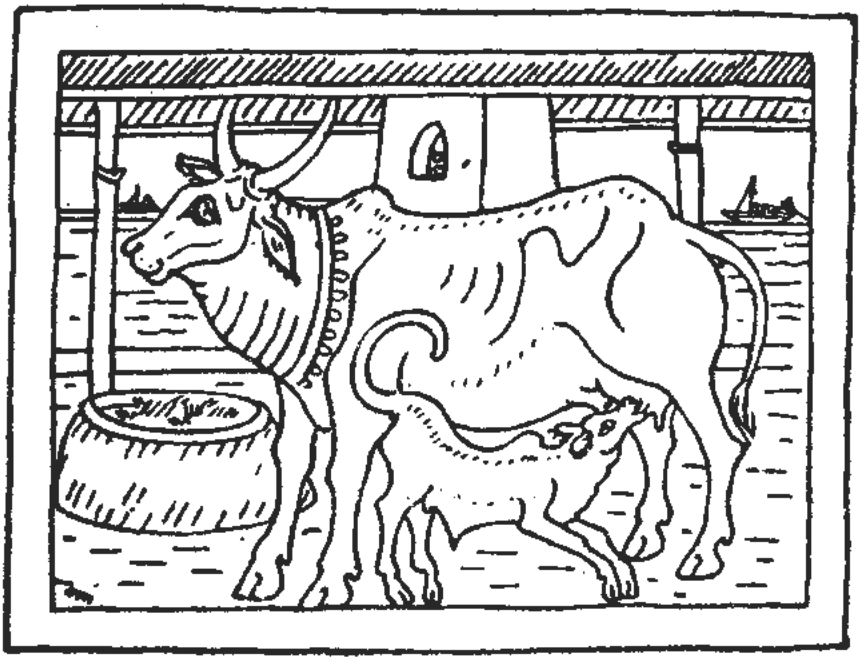

পঞ্চম পাঠ

বর্ষা নেমেছে। গর্মি আর নেই। থেকে থেকে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চম্‌কানি চলছে। শিলং পর্বতে ঝর্‌নার জল বেড়ে উঠল। কর্ণফুলি নদীতে বন্যা দেখা দিয়েছে। সর্ষেখেত ডুবিয়ে দিলে। দুর্গানাথের আঙিনায় জল উঠেছে। তার দর্মার বেড়া ভেঙে গেল।

বেচারা গোরুগুলোর বড়ো দুর্গতি। এক-হাঁটু পাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। চাষিদের কাজকর্ম সব বন্ধ। ঘরে ঘরে সর্দি-কাশি। কর্তাবাবু বর্ষাতি পরে চলেছেন। সঙ্গে তাঁর আর্দালি তুর্কি মিঞা। গর্ত সব ভরে গিয়ে ব্যাঙের বাসা হল। পাড়ার নর্দমাগুলো জলে ছাপিয়ে গেছে।

ঐখানে মা পুকুর-পাড়ে
জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
হোথায় হব বনবাসী,
    কেউ কোত্থাও নেই।
ওইখানে ঝাউতলা জুড়ে
বাঁধব তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,
শুক্‌নো পাতা বিছিয়ে ঘরে
    থাকব দুজনেই।
বাঘ ভাল্লুক অনেক আছে—
আসবে না কেউ তোমার কাছে,

দিনরাত্তির কোমর বেঁধে
থাকব পাহারাতে।
রাক্ষসেরা ঝোপে-ঝাড়ে
মারবে উঁকি আড়ে আড়ে,
দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি
ধনুক নিয়ে হাতে।

আঁচলেতে খই নিয়ে তুই
যেই দাঁড়াবি দ্বারে,
অমনি যত বনের হরিণ
আসবে সারে সারে।
শিংগুলি সব আঁকা বাঁকা,
গায়েতে দাগ চাকা চাকা,
লুটিয়ে তারা পড়বে ভুঁয়ে
পায়ের কাছে এসে।
ওরা সবাই আমায় বোঝে,
করবে না ভয় একটুও যে,
হাত বুলিয়ে দেব গায়ে,
বসবে কাছে ঘেঁষে।
ফল্‌সাবনে গাছে গাছে
ফল ধরে মেঘ ঘনিয়ে আছে,
ওইখানেতে ময়ূর এসে
নাচ দেখিয়ে যাবে।

শালিখরা সব মিছিমিছি
লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি,
কাঠবেড়ালি লেজটি তুলে
হাত থেকে ধান খাবে।

ষষ্ঠ পাঠ

উস্রি নদীর ঝর্‌না দেখতে যাব। দিনটা বড়ো বিশ্রী। শুনছ বজ্রের শব্দ? শ্রাবণ মাসের বাদ্‌লা। উস্রিতে বান নেমেছে। জলের স্রোত বড়ো দুরন্ত। অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে। অনন্ত, এসো এক সঙ্গে যাত্রা করা যাক। আমাদের দু-দিন মাত্র ছুটি। কলেজের ছাত্রেরা গেছে ত্রিবেণি, কেউ-বা গেছে আত্রাই। সাঁত্রাগাছির কান্তি মিত্র যাবে আমাদের সঙ্গে উস্রির ঝর্‌নায়। শান্তা কি যেতে পারবে। সে হয়তো শ্রান্ত হয়ে পড়বে। পথে যদি

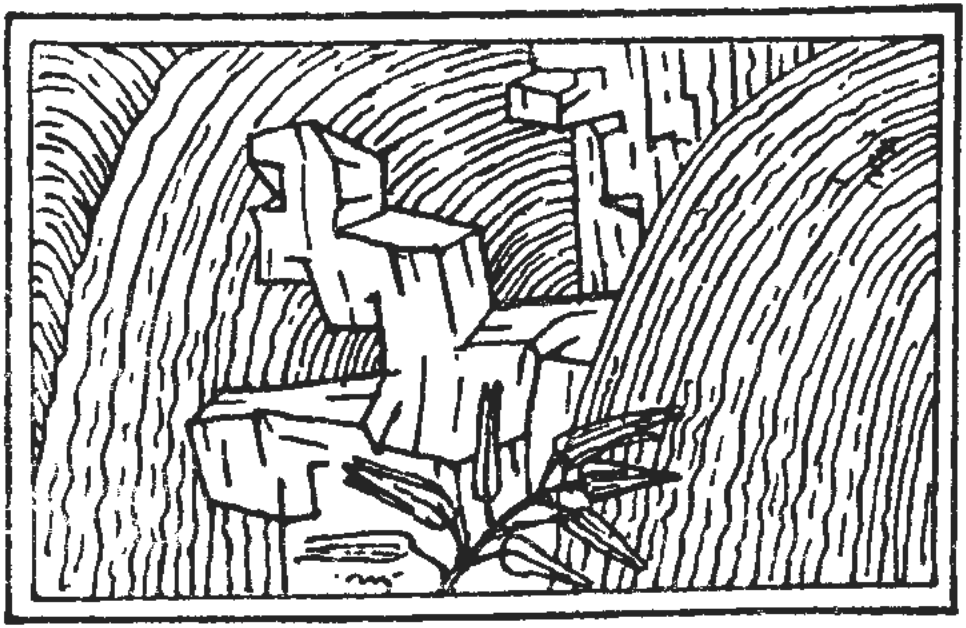

জল নামে মিশ্রদের বাড়ি আশ্রয় নেব। সঙ্গে খাবার আছে তো? সন্দেশ আছে, পান্তোয়া আছে, বোঁদে আছে। আমাদের কান্ত চাকর শীঘ্র কিছু খেয়ে নিক। তার খাবার আগ্রহ দেখিনে। সে ভোরের বেলায় পান্তা ভাত খেয়ে বেরিয়েছে। তার বোন ক্ষান্তমণি তাকে খাইয়ে দিলে।

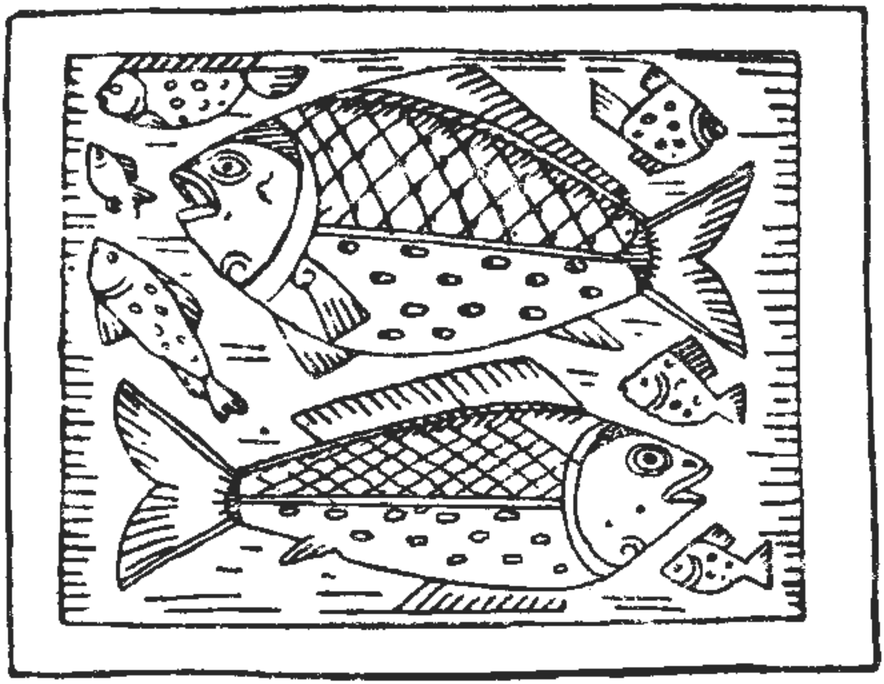

সপ্তম পাঠ

শ্রীশকে বোলো, তার শরীর যদি সুস্থ থাকে সে যেন বসন্তর দোকানে যায়। সেখান থেকে খাস্তা কচুরি আনা চাই। আর কিছু পেস্তা বাদাম কিনে আনতে হবে। দোকানের রাস্তা সে জানে তো? বাজারে একটা আস্ত কাতলা মাছ যদি পায়, নিয়ে আসে যেন। আর বস্তা থেকে গুন্তি করে ত্রিশটা আলু আনা চাই। এবার আলু

খুব সস্তা। একান্ত যদি না পাওয়া যায়, কিছু ওল আনিয়ে নিয়ো। রাস্তায় রেঁধে খেতে হবে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। মনে রেখো— কড়া চাই, খুন্তি চাই; জলের পাত্র একটা নিয়ো। অত ব্যস্ত হয়েছ কেন? আস্তে আস্তে চলো। ক্লান্ত হয়ে পড়বে যে।

আমি যে রোজ সকাল হ'লে
যাই শহরের দিকে চ'লে
তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চ'ড়ে;
সকাল থেকে সারা দুপর
ইঁট সাজিয়ে ইঁটের উপর
খেয়াল-মতো দেয়াল তুলি গ'ড়ে।
সমস্ত দিন ছাত-পিটুনি
গান গেয়ে ছাত পিটোয় শুনি,
অনেক নীচে চলছে গাড়ি ঘোড়া।

বাসনওয়ালা থালা বাজায়;
সুর ক'রে ওই হাঁক দিয়ে যায়
আতাওয়ালা নিয়ে ফলের ঝোড়া।
সাড়ে চারটে বেজে ওঠে,
ছেলেরা সব বাসায় ছোটে
হো হো ক'রে উড়িয়ে দিয়ে ধুলো।

রোদ্দুর যেই আসে প'ড়ে
পুবের মুখে কোথা ওড়ে
　দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো।
আমি তখন দিনের শেষে
ভারার থেকে নেমে এসে
　আবার ফিরে আসি আপন গাঁয়ে—
জান না কি আমার পাড়া
যেখানে ওই খুঁটি গাড়া
পুকুর-পাড়ে গাজন-তলার বাঁয়ে।।

অষ্টম পাঠ

আর্মানি গির্জের কাছে আপিস। যাওয়া মুশকিল হবে। পূর্ব দিকের মেঘ ইস্পাতের মতো কালো। পশ্চিম দিকের মেঘ ঘন নীল। সকালে রৌদ্র ছিল, নিশ্চিন্ত ছিলাম। দেখতে দেখতে বিস্তর মেঘ জমেছে। বাদ্‌লা

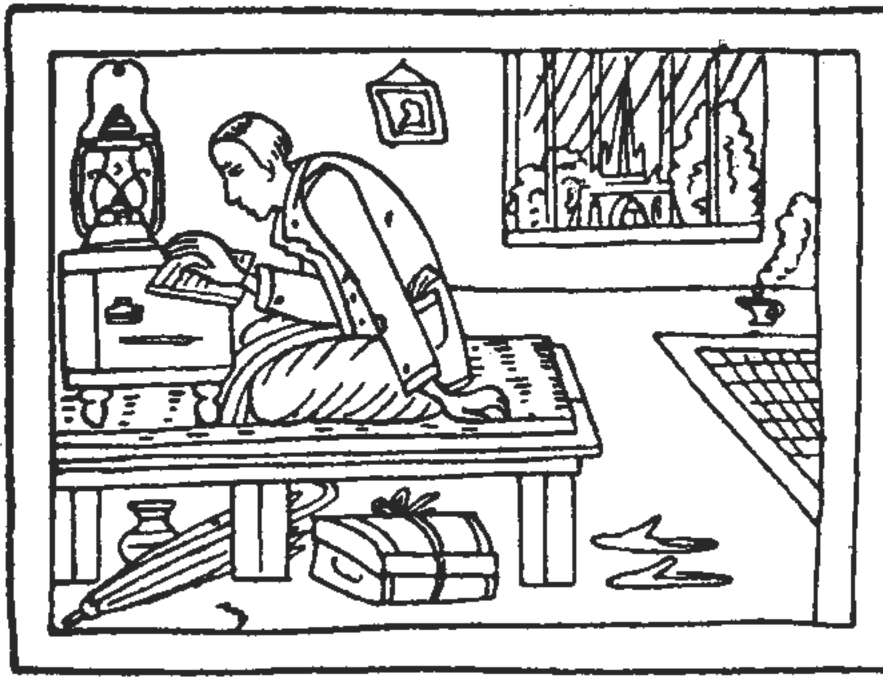

বেশিক্ষণ স্থায়ী না হ'লে বাঁচি। শরীরটা অসুস্থ আছে। মাথা ধরেছে, স্থির হয়ে থাকতে পারছিনে। আপিসের ভাত এখনও হ'ল না। উনানের আগুনটা উস্‌কিয়ে দাও। ঠাকুর আমার ঝোলে যেন লঙ্কা না দেয়। বঙ্কিমকে আমার অঙ্কের খাতাটা আনতে বোলো, দোতলা ঘরের পালঙ্কের উপর আছে। কঙ্কা খাতা নিয়ে খেলতে গিয়ে তার পাতা ছিঁড়ে দিয়েছে।

নবম পাঠ

বৃষ্টি নামল দেখছি। সৃষ্টিধর, ছাতাটা খুঁজে নিয়ে আয়; না পেলে ভারী কষ্ট হবে। কেষ্ট, শিষ্ট শান্ত হয়ে ঘরে ব'সে থাকো। দস্টামি কোরো না। বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে। সঞ্জীবকে ব'লে দেব, তোমার জন্যে মিষ্টি লজঞ্জুস এনে দেবে। কাল যে তোমাকে খেলার খঞ্জনী দিলাম,

সেটা হারিয়েছ বুঝি? ও বাড়ি থেকে রঞ্জনকে ডেকে দেব, সে তোমার সঙ্গে খেলা করবে। কাঞ্জিলাল, ব্যাঙগুলো ঘরের মধ্যে আসে যে, ঘর নষ্ট করবে। ওরে তুষ্টু, ওদের তাড়িয়ে দে। ঘন মেঘে সব অস্পষ্ট হয়ে এল। আর দৃষ্টি চলে না। বোষ্টমি গান গাইতে এসেছে। ওকে নিষ্ঠুর হয়ে বাইরে রেখো না। বৃষ্টিতে ভিজে যাবে, কষ্ট পাবে।

সেদিন ভোরে দেখি উঠে
বৃষ্টি বাদল গেছে ছুটে,
রোদ উঠেছে ঝিল্‌মিলিয়ে
  বাঁশের ডালে ডালে।
ছুটির দিনে কেমন সুরে
পুজোর সানাই বাজায় দূরে,

তিনটে শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরের চালে।
শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কাদের ছাদের ’পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগনি রঙের শাড়ি।

চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই—
তেপান্তরের পার বুঝি ওই,
মনে ভাবি ওইখানেতেই
　আছে রাজার বাড়ি।
থাকত যদি মেঘে-ওড়া
পক্ষীরাজের বাচ্ছা ঘোড়া
তক্ষনি যে যেতেম তারে
　লাগাম দিয়ে ক'ষে;
যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমিরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি
　গাছের তলায় ব'সে॥

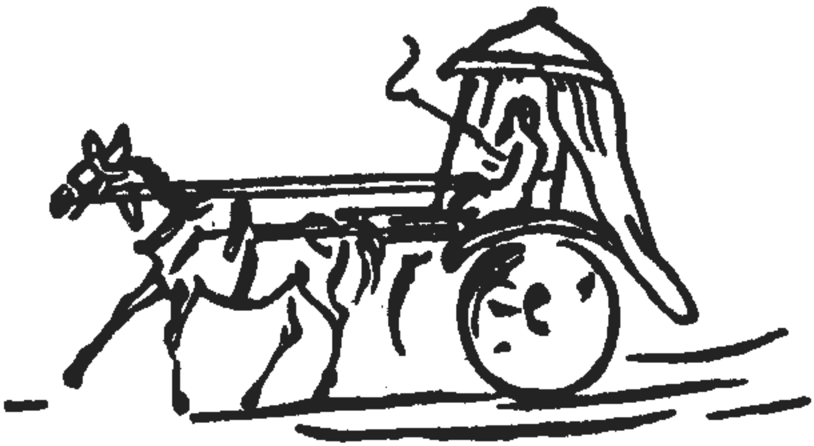

দশম পাঠ

এত রাত্রে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কে? কেউ না, বাতাস ধাক্কা দিচ্ছে। এখন অনেক রাত্রি। উল্লাপাড়ার মাঠে শেয়াল ডাকছে— হুক্কাহুয়া। রাস্তায় ও কি এক্কা গাড়ির শব্দ? না, মেঘ গুর্‌গুর্‌ করছে। উল্লাস, তুমি যাও তো, কুকুরের বাচ্ছাটা বড়ো চেঁচাচ্ছে, ঘুমোতে দিচ্ছে না, ওকে শান্ত ক'রে এসো। ওটা কীসের ডাক উল্লাস? অশ্বত্থ গাছে পেঁচার ডাক। উচ্ছের খেত থেকে ঝিল্লি ওই ঝিঁ ঝিঁ করছে। দরজার পাল্লাটা বাতাসে ধড়াস

ধড়াস করে পড়ছে, বন্ধ ক'রে দাও। ওটা কি কান্নার শব্দ? না, রান্নাঘর থেকে বিড়াল ডাকছে। যাও-না

উল্লাস, থামিয়ে দিয়ে এসো গে। আমার ভয় করছে। বড়ো অন্ধকার। ভজ্জুকে ডেকে দিই। ছি ছি উল্লাস, ভয় করতে লজ্জা করে না। আচ্ছা, আমি নিজে যাচ্ছি। আর তো রাত নেই। পুব দিক উজ্জ্বল হয়েছে। ও ঘরে বিছানায় খুকি চঞ্চল হয়ে উঠল। বাঞ্ছাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দাও। বাঞ্ছা শীঘ্র আমার জন্যে চা আনুক আর কিঞ্চিৎ বিস্কুট। আমি ততক্ষণ মুখ ধুয়ে আসি। রক্ষামণি থাক্ খুকুর কাছে। তুমিও সাজসজ্জা ক'রে তৈরি থাকো উল্লাস। বেড়াতে যাব। উত্তম কথা। কিন্তু ঘাস ভিজে কেন? এক পত্তন বৃষ্টি হয়ে গেল বুঝি? এবার লন্ঠনটা নিবিয়ে

দাও। আর মন্টুকে বলো, বারান্দা পরিষ্কার ক'রে দিক। এখনি রেভারেন্ড এন্ডার্‌সন আসবেন। পণ্ডিত-মশায়েরও আসবার সময় হ'ল। ওই শোনো, কুণ্ডুদের বাড়ি ঢং ঢং করে ছটার ঘণ্টা বাজে।

আকাশ-পারে পুবের কোণে
কখন যেন অন্যমনে
ফাঁক ধরে ওই মেঘে,
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে
বন্ধ চোখের পাতা মেলে
আকাশ ওঠে জেগে।
ছিঁড়ে-যাওয়া মেঘের থেকে
পুকুরে রোদ পড়ে বেঁকে,
লাগায় ঝিলিমিলি।

বাঁশ-বাগানের মাথায় মাথায়
তেঁতুল গাছের পাতায় পাতায়
হাসায় খিলিখিলি।
হঠাৎ কীসের মন্ত্র এসে
ভুলিয়ে দিলে এক নিমেষে
বাদল-বেলার কথা।
হারিয়ে-পাওয়া আলোটিরে
নাচায় ডালে ফিরে ফিরে
ঝুম্‌কো ফুলের লতা॥

একাদশ পাঠ

ভক্তরামের নৌকো শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। ভক্তরাম সেই নৌকো সস্তা দামে বিক্রি করে। শক্তিনাথ-বাবু কিনে নেন। শক্তিনাথ আর মুক্তিনাথ দুই ভাই। যে পাড়ায় থাকেন তার নাম জেলেবস্তি। তাঁর বাড়ি খুব মস্ত। সামনে নদী, পিছনে বড়ো রাস্তা। তাঁর দারোয়ান শক্তু সিং আর আক্রম মিশ্র রোজ সকালে

কুস্তি করে। শক্তিনাথ-বাবুর চাকরের নাম অক্রূর। তাঁর বড়ো ছেলের নাম বিক্রম। ছোটো ছেলের নাম শক্রনাথ। শক্তিবাবু তাঁর নৌকো লাল রং ক'রে নিলেন। তার নাম দিলেন রক্তজবা। তিনি মাঝে মাঝে নৌকোয় করে কখনো তিস্তা নদীতে, কখনো আত্রাই নদীতে, কখনো ইচ্ছামতীতে বেড়াতে যান। একদিন অঘ্রান মাসে পত্র পেলেন, বিপ্রগ্রামে বাঘ এসেছে। শিকারে যাত্রা করলেন। সেদিন শুক্রবার। শুক্লপক্ষের চন্দ্র সবে অস্ত গেছে। আক্রম বন্দুক নিয়ে চলল। আর দুটো বল্লম ছিল। সিন্দুকে ছিল গুলি বারুদ। নদীতে প্রবল স্রোত। বেলা যখন দুই প্রহর, নৌকো নন্দগ্রামে পৌঁছোল। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। এক ভদ্রলোক খবর দিলেন, কাছেই বন্দিপুরের বন, সেখানে আছে বাঘ।

শক্তিবাবু আর আক্রম বাঘ খুঁজতে নামলেন। জঙ্গল ঘন হয়ে এল। ঘোর অন্ধকার। কিছু দূরে গিয়ে দেখেন, এক পোড়ো মন্দির। জনপ্রাণী নেই। শক্তিবাবু

বললেন, এইখানে একটু বিশ্রাম করি। সঙ্গে ছিল লুচি, আলুর দম আর পাঁঠার মাংস। তাই খেলেন। আক্রম খেল চাটনি দিয়ে রুটি। তখন বেলা পড়ে আসছে। গাছের ফাঁক দিয়ে বাঁকা হয়ে রৌদ্র পড়ে। প্রকাণ্ড অর্জুন গাছের উপর কতকগুলো বাঁদর; তাদের লম্বা লেজ ঝুলছে। শক্তিবাবু কিছু দূর গিয়ে দেখলেন, একটা ছোটো সোঁতা। তাতে এক-হাঁটুর বেশি জল হবে না। তার ধারে বালি। সেই বালির উপর বড়ো বড়ো থাবার দাগ। নিশ্চয় বাঘের থাবা। শক্তিবাবু ভাবতে লাগলেন, কী করা কর্তব্য। অঘ্রান মাসের বেলা। পশ্চিমে সূর্য অস্ত গেল। সন্ধ্যা হ'তেই ঘোর অন্ধকার। কাছে তেঁতুল গাছ। তার উপরে দুজনে চড়ে বসলেন। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে চাদর দিয়ে নিজেদের বাঁধলেন, পাছে ঘুম এলে প'ড়ে যান। কোথাও আলো নেই। তারা দেখা যায় না। কেবল অসংখ্য জোনাকি গাছে গাছে জ্বলছে।

শক্তিবাবুর একটু নিদ্রা এসেছে এমন সময়ে হঠাৎ ধপ্ ক'রে একটা শব্দ হওয়াতে চমকে জেগে উঠলেন। দেখলেন, কখন বাঁধন আলগা হয়ে আক্রম নীচে পড়ে গেছে। শক্তিনাথ তাকে দেখতে তাড়াতাড়ি নেমে

এলেন। হঠাৎ দেখেন, কাছেই অন্ধকারে দুটো চোখ জ্বল্ জ্বল্ করছে। কী সর্বনাশ! এ তো বাঘের চোখ। বন্দুক তোলবার সময় নেই। ভাগ্যে দুজনের কাছে দুটো বিজলি বাতির মশাল ছিল। সে দুটো যেমনি হঠাৎ জ্বালানো, অমনি বাঘ ভয়ে দৌড় দিলে। সে রাত্রি আবার দুজনের গাছে কাটল।

পরের দিন সকাল হ'ল। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা মেলে না, যতই চলে জঙ্গল বেড়ে যায়। গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগে। রক্ত পড়ে। খিদে পেয়েছে। তেষ্টা পেয়েছে। এমন সময় মানুষের গলার শব্দ শোনা গেল। এক দল কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে চলেছে। শক্তিবাবু বললেন, "তোমাদের ঘরে নিয়ে চলো। রাস্তা ভুলেছি। কিছু খেতে দাও।" নদীর ধারে একটা ঢিবির 'পরে তাঁদের কুঁড়েঘর। গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া। কাছে একটা মস্ত বট গাছ। তার ডাল থেকে লম্বা লম্বা ঝুরি নেমেছে। সেই গাছে যত রাজ্যের পাখির বাসা।

কাঠুরিয়ারা শক্তিবাবুকে, আক্রমকে যত্ন ক'রে খেতে দিলে। তালপাতার ঠোঙায় এনে দিলে চিঁড়ে আর বনের মধু। আর দিলে ছাগলের দুধ। নদী থেকে ভাঁড়ে করে এনে দিলে জল। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। শরীর ছিল ক্লান্ত। শক্তিবাবু বটের

ছায়ায় শুয়ে ঘুমোলেন। বেলা যখন চার প্রহর তখন কাঠুরিয়াদের সর্দার পথ দেখিয়ে নৌকোয় তাঁদের পৌঁছিয়ে দিলে। শক্তিবাবু দশ টাকার নোট বের করে বললেন, “বড়ো উপকার করেছ, বকশিশ লও।”

সর্দার হাত জোড় করে বললে, “মাপ করবেন, টাকা নিতে পারব না, নিলে অধর্ম হবে।” এই বলে নমস্কার করে সর্দার চলে গেল।

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু—
“চেয়ে দেখো” “চেয়ে দেখো” বলে যেন বিনু।
চেয়ে দেখি, ঠোকাঠুকি বরগা-কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।
ইঁটে-গড়া গন্ডার বাড়িগুলো সোজা
চলিয়াছে, দুদ্দাড় জানালা দরোজা।
রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ,
পিঠে তার ট্রামগাড়ি পড়ে ধুপ্‌ধাপ্।

দোকান বাজার সব নামে আর উঠে,
ছাদের গায়েতে ছাদ মরে মাথা কুটে।
হাওড়ার ব্রিজ চলে মস্ত সে বিছে,
হ্যারিসন রোড চলে তার পিছে পিছে।
মনুমেন্টের দোল, যেন খ্যাপা হাতি
শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি।
আমাদের ইস্‌কুল ছোটে হন্‌ হন্‌,
অঙ্কের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।
ম্যাপগুলো দেয়ালেতে করে ছটফট,
পাখি যেন মারিতেছে পাখার ঝাপট।
ঘণ্টা কেবলি দোলে, ঢঙ ঢঙ বাজে—
যত কেন বেলা হোক তবু থামে না যে।
লক্ষ লক্ষ লোক বলে, "থামো থামো,
কোথা হতে কোথা যাবে, এ কী পাগলামো!"
কলিকাতা শোনে নাকো চলার খেয়ালে;
নৃত্যের নেশা তার স্তম্ভে দেয়ালে।

আমি মনে মনে ভাবি, চিন্তা তো নাই,
কলিকাতা যাক নাকো সোজা বোম্বাই।
দিল্লি লাহোরে যাক, যাক না আগ্‌রা—
মাথায় পাগ্‌ড়ি দেব পায়েতে নাগ্‌রা।
কিংবা সে যদি আজ বিলাতেই ছোটে
ইংরেজ হবে সবে বুট-হ্যাট-কোটে।
কীসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যেই—
দেখি, কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই।

দ্বাদশ পাঠ

গুপ্তিপাড়ার বিশ্বম্ভর-বাবু পাল্‌কি চড়ে চলেছেন সপ্তগ্রাম। ফাল্গুন মাস। কিন্তু এখনো খুব ঠান্ডা। কিছু আগে প্রায় সপ্তাহ ধ'রে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বিশ্বম্ভর-বাবুর গায়ে এক মোটা কম্বল। পাল্‌কির সঙ্গে চলেছে তার শম্ভু চাকর, হাতে এক লম্বা লাঠি। পাল্‌কির ছাদে ওষুধের

বাক্স, দড়ি দিয়ে বাঁধা। শম্ভুর গায়ে অদ্ভুত জোর। একবার কুম্ভীরার জঙ্গালে তাকে ভল্লুকে ধরেছিল। সঙ্গে বন্দুক ছিল না। শুদ্ধ কেবল লাঠি নিয়ে ভল্লুকের সঙ্গে তার যুদ্ধ হল। শম্ভুর হাতের লাঠি খেয়ে ভল্লুকের মেরুদণ্ড গেল ভেঙে। তার আর উত্থানশক্তি রইল না। আর একবার শম্ভু বিশ্বম্ভর-বাবুর সঙ্গে গিয়েছিল স্বর্ণগঞ্জে। সেখানে পদ্মানদীর চরে রান্না চড়াতে হবে। তখন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন। পদ্মার ধারে ছোটো ছোটো ঝাউগাছের জঙ্গাল। উনান ধরানো চাই। দা দিয়ে শম্ভু ঝাউডাল কেটে আঁটি বাঁধল। অসহ্য রৌদ্র। বড়ো তৃষ্ণা পেয়েছে। নদীতে শম্ভু জল খেতে গেল। এমন সময়ে দেখলে, একটা বাছুরকে ধরেছে কুমিরে। শম্ভু এক লম্ফে জলে প'ড়ে কুমিরের পিঠে চ'ড়ে বসল। দা দিয়ে তার গলায় পোঁচ দিতে লাগল। জল লাল হয়ে উঠল রক্তে। কুমির যন্ত্রণায় বাছুরকে দিল ছেড়ে। শম্ভু সাঁতার দিয়ে ডাঙায় উঠে এল।

বিশ্বম্ভর-বাবু ডাক্তার। রোগী দেখতে চলেছেন বহু দূরে। সেখানে ইস্‌টিমার-ঘাটের ইস্‌টেশন-মাস্টার মধু বিশ্বাস। তাঁর ছোটো ছেলের অম্লশূল, বড়ো কষ্ট পাচ্ছে।

বিষ্ণুপুরের পশ্চিম ধারের মাঠ প্রকাণ্ড। সেখানে যখন পাল্‌কি এল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাখাল গোরু নিয়ে চলেছে গোষ্ঠে ফিরে। বিশ্বম্ভর-বাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে বাপু, সপ্তগ্রাম কত দূরে বলতে পার?"

রাখাল বললে, “আজ্ঞে, সে তো সাত ক্রোশ হবে। আজ সেখানে যাবেন না। পথে ভীষ্মহাটের মাঠ, তার কাছে শ্মশান। সেখানে ডাকাতের ভয়।”

ডাক্তার বললেন, “বাবা, রোগী কষ্ট পাচ্ছে, আমাকে যেতেই হবে।”

তিল্লনি খালের ধারে যখন পালকি এল রাত্রি তখন দশটা। বাঁধন আলগা হয়ে পালকির ছাদ থেকে ডাক্তারের বাক্সটা গেল প'ড়ে। ক্যাস্টর অয়েলের শিশি ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল। বাক্সটা তো ফের শক্ত ক'রে বাঁধলে। কিন্তু আবার বিপদ। খাল পেরিয়ে আন্দাজ দু ক্রোশ পথ গেছে, এমন সময় মড়্ মড়্ ক'রে ডান্ডা গেল ভেঙে, পাল্‌কিটা পড়ল মাটিতে। পাল্‌কি হালকা কাঠে তৈরি; বিশ্বম্ভর-বাবুর দেহটি স্থূল।

আর উপায় নেই, এইখানেই রাত্রি কাটাতে হবে। ডাক্তার-বাবু ঘাসের উপর কম্বল পাতলেন, লণ্ঠনটি রাখলেন কাছে। শম্ভুকে নিয়ে গল্প করতে লাগলেন।

এমন সময়ে বেহারাদের সর্দার বুদ্ধু এসে বললে, “ওই-যে কারা আসছে, ওরা ডাকাত সন্দেহ নেই।”

বিশ্বম্ভর-বাবু বললেন, “ভয় কী, তোরা তো সবাই আছিস।” বুদ্ধু বললে, “বল্লু পালিয়েছে, পল্লুকেও দেখছিনে। বক্সি লুকিয়েছে ওই ঝোপের মধ্যে। ভয়ে বিন্নুর হাত-পা আড়ষ্ট।”

শুনে ডাক্তার তো ভয়ে কম্পিত। ডাকলেন, “শম্ভু।”

শম্ভু বললে, “আজ্ঞে।”

ডাক্তার বললেন, “এখন উপায় কী?”

শম্ভু বললে, “ভয় নেই, আমি আছি।”

ডাক্তার বললেন, “ওরা যে পাঁচজন।”

শম্ভু বললে, “আমি যে শম্ভু।” এই ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে এক লম্ফ দিলে, গর্জন করে বললে, “খবর্দার।”

ডাকাতেরা অট্টহাস্য ক'রে এগিয়ে আসতে লাগল। তখন শম্ভু পালকির সেই ভাঙা ডান্ডাখানা তুলে নিয়ে ওদের দিকে ছুড়ে মারলে। তারি এক ঘায়ে তিনজন

একসঙ্গে পড়ে গেল। তার পরে শম্ভু লাঠি ঘুরিয়ে যেই ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকি দুজনে দিল দৌড়।

তখন ডাক্তার-বাবু ডাকলেন, "শম্ভু।"

শম্ভু বললে, "আজ্ঞে।"

বিশ্বম্ভর-বাবু বললেন, "এইবার বাক্সটা বের করো।"

শম্ভু বললে, "কেন, বাক্স নিয়ে কী হবে?"

ডাক্তার বললেন, "ওই তিনটে লোকের ডাক্তারি করা চাই। ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে।"

রাত্রি তখন অল্পই বাকি। বিশ্বম্ভর-বাবু আর শম্ভু দুজনে মিলে তিনজনের শুশ্রূষা করলেন।

সকাল হয়েছে। ছিন্ন মেঘের মধ্য দিয়ে সূর্যের রশ্মি ফেটে পড়ছে। একে একে সব বেহারা ফিরে আসে। বল্লু এল, পল্লু এল, বক্সির হাত ধ'রে এল বিষ্ণু, তখনো তার হৃৎপিণ্ড কম্পমান।

স্টিমার আসিছে ঘাটে, প'ড়ে আসে বেলা—
পূজার ছুটির দল, লোকজন মেলা
এল দূর দেশ হতে; বৎসরের পরে
ফিরে আসে যে যাহার আপনার ঘরে।
জাহাজের ছাদে ভিড়; নানা লোকে নানা
মাদুরে কম্বলে লেপে পেতেছে বিছানা
ঠেসাঠেসি ক'রে। তারি মাঝে হরেরাম
মাথা নেড়ে বাজাইছে হারমোনিয়াম।
বোঝা আছে কত শত, বাক্স কত রূপ,
টিন বেত চামড়ার পুঁটুলির স্তূপ,

থলি ঝুলি ক্যাম্বিসের, ডালা ঝুড়ি ধামা
সবজিতে ভরা। গায়ে রেশমের জামা,
কোমরে চাদর বাঁধা, চণ্ডী অবিনাশ
কলিকাতা হতে আসে, বঙ্কু শ্যামদাস
অম্বিকা অক্ষয়; নতুন চিনের জুতা
করে মস্‌মস্‌, মেরে কনুইয়ের গুঁতা
ভিড় ঠেলে আগে চলে; হাতে বাঁধা ঘড়ি
চোখেতে চশমা কারো, সরু এক ছড়ি

সবেগে দুলায়। ঘন ঘন ডাক ছাড়ে
স্টিমারের বাঁশি; কে পড়ে কাহার ঘাড়ে।
সবাই সবার আগে যেতে চায় চ'লে—
ঠেলাঠেলি, বকাবকি। শিশু মার কোলে
চিৎকার-স্বরে কাঁদে। গড়্ গড়্ ক'রে
নোঙর ডুবিল জলে; শিকলের ডোরে
জাহাজ পড়িল বাঁধা; সিঁড়ি গেল নেমে,
এঞ্জিনের ধক্‌ধকি সব গেল থেমে।
"কুলি কুলি" ডাক পড়ে; ডাঙা হতে মুটে
দুড়্‌দাড়্ ক'রে এল দলে দলে ছুটে।
তীরে বাজাইয়া হাঁড়ি গাহিছে ভজন
অন্ধ বেণি। যাত্রীদের আত্মীয় স্বজন
অপেক্ষা করিয়া আছে; নাম ধ'রে ডাকে,
খুঁজে খুঁজে বের করে যে চায় যাহাকে।
চলিল গোরুর গাড়ি, চলে পাল্‌কি ডুলি,
স্যাকরা-গাড়ির ঘোড়া উড়াইল ধূলি।

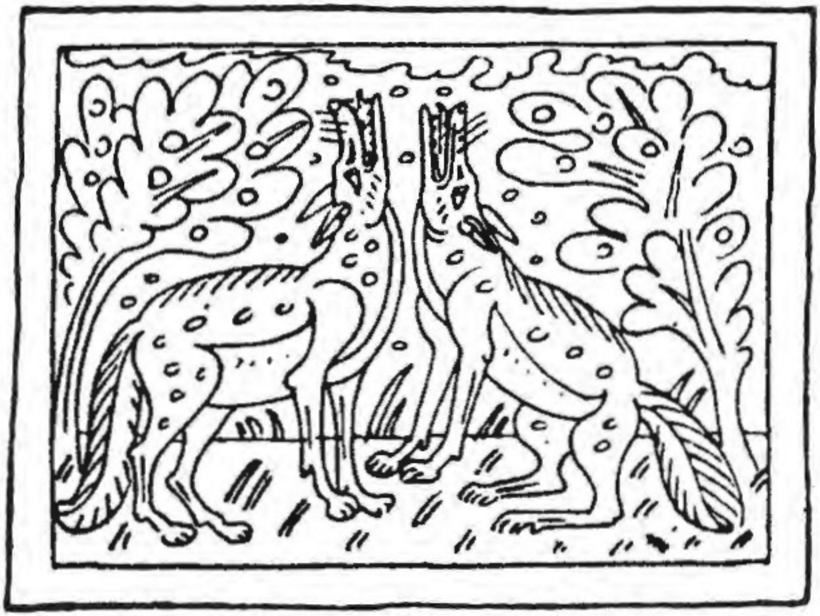

সূর্য গেল অস্তাচলে; আঁধার ঘনাল;
হেথা হোথা কেরোসিন লণ্ঠনের আলো
দুলিতে দুলিতে যায়, তার পিছে পিছে
মাথায় বোঝাই নিয়ে মুটেরা চলিছে।
শূন্য হয়ে গেল তীর। আকাশের কোণে
পঞ্চমীর চাঁদ ওঠে। দূরে বাঁশবনে
শেয়াল উঠিল ডেকে। মুদির দোকানে
টিম্ টিম্ ক'রে দীপ জ্বলে একখানে।।

ত্রয়োদশ পাঠ

উদ্ধব মণ্ডল জাতিতে সদ্‌গোপ। তার অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা। ভূসম্পত্তি যা-কিছু ছিল ঋণের দায়ে বিক্রয় হয়ে গেছে। এখন মজুরি ক'রে কায়ক্লেশে তার দিনপাত হয়।

এ দিকে তার কন্যা নিস্তারিণীর বিবাহ। বরের নাম বটকৃষ্ণ। তার অবস্থা মন্দ নয়। খেতের উৎপন্ন শস্য দিয়ে সহজেই সংসার-নির্বাহ হয়। বাড়িতে পূজা-অর্চনা ক্রিয়াকর্মও আছে।

আগামী কাল উনিশে জ্যৈষ্ঠ বিবাহের দিন। বরযাত্রীর দল আসবে। তার জন্যে আহারাদির উদ্‌যোগ করা চাই। পাড়ার লোকে কিছু কিছু সাহায্য করেছে। অভাব তবু যথেষ্ট।

পাড়ার প্রান্তে একটি বড়ো পুষ্করিণী। তার নাম পদ্মপুকুর। বর্তমান ভূস্বামী দুর্লভ-বাবুর পূর্বপুরুষদের আমলে এই পুষ্করিণী সর্বসাধারণে ব্যবহার করতে পেত।

এমন-কি, গ্রামের গৃহস্থ বাড়ির কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রয়োজন উপস্থিত হ'লে মাছ ধ'রে নেবার বাধা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি দুর্লভ-বাবু প্রজাদের সেই অধিকার বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। অল্প কিছুদিন আগে খাজনা দিয়ে বৃন্দাবন জেলে তাঁর কাছ থেকে এই পুকুরে মাছ ধরবার স্বত্ব পেয়েছে।

উদ্ধব এ সংবাদ ঠিকমতো জানত না। তাই সেদিন রাত্রি থাকতে উঠে পদ্মপুকুর থেকে একটা বড়ো দেখে রুই মাছ ধ'রে বাড়ি আনবার উপক্রম করছে। এমন সময় বিঘ্ন ঘটল। সেদিন দুর্লভ-বাবুর ছোটো কন্যার অন্নপ্রাশন। খুব সমারোহ ক'রে লোক খাওয়ানো হবে। তারি মাছ সংগ্রহের জন্য বাবুর কর্মচারী কৃত্তিবাস কয়েকজন জেলে নিয়ে সেই পুষ্করিণীর ধারে এসে

উপস্থিত। দেখে, উদ্ধব এক মস্ত রুই মাছ ধরেছে। সেটা তখনি তার কাছ থেকে কেড়ে নিলে। উদ্ধব কৃত্তিবাসের হাতে পায়ে ধ'রে কাঁদতে লাগল। কোনো ফল হ'ল না।

ধনঞ্জয় পেয়াদা তাকে বলপূর্বক ধ'রে নিয়ে গেল দুর্লভ-বাবুর কাছে।

দুর্লভের বিশ্বাস ছিল যে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অত্যাচারী ব'লে উদ্ধব তাঁর দুর্নাম করেছে। তাই তার

উপরে তাঁর বিষম ক্রোধ। বললেন, "তুই মাছ চুরি করেছিস, তার দণ্ড দিতে হবে।"

ধনঞ্জয়কে বললেন, "একে ধরে নিয়ে যাও। যতক্ষণ না দশ টাকা দণ্ড আদায় হয়, ছেড়ে দিয়ো না।"

উদ্ধব হাত জোড় করে বললে, "আমার দশ পয়সাও নেই। কাল কন্যার বিবাহ। কাজ শেষ হয়ে যাক, তার পরে আমাকে শাস্তি দেবেন।"

দুর্লভ-বাবু তার কাতর বাক্যে কর্ণপাত করলেন না।

ধনঞ্জয় উদ্ধবকে সকল লোকের সম্মুখে অপমান ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল।

দুর্লভের পিসি কাত্যায়নী ঠাকরুন সেদিন অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে অন্তঃপুরে উপস্থিত ছিলেন। উদ্ধবের স্ত্রী মোক্ষদা তাঁর কাছে কেঁদে এসে পড়ল।

কাত্যায়নী দুর্লভকে ডেকে বললেন, "বাবা, নিষ্ঠুর হোয়ো না। উদ্ধবের কন্যার বিবাহে যদি অন্যায় কর, তবে তোমার কন্যার অন্নপ্রাশনে অকল্যাণ হবে।

উদ্ধবকে মুক্তি দাও।"

দুর্লভ পিসির অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেলেন। কৃত্তিবাসকে ডেকে কাত্যায়নী বললেন, "উদ্ধবের দণ্ডের এই দশ টাকা দিলাম। এখনি তাকে ছেড়ে দাও।"

উদ্ধব ছাড়া পেলে। কিন্তু অপমানে লজ্জায় তার দুই চক্ষু দিয়ে জল পড়তে লাগল।

পরদিন গোধূলি-লগ্নে নিস্তারিণীর বিবাহ। বেলা যখন চারটে তখন পাঁচজন বাহক উদ্ধবের কুটির-প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত। কেউ-বা এনেছে ঝুড়িতে মাছ, কেউ-বা এনেছে হাঁড়িতে দই, কারও হাতে থালায়-ভরা সন্দেশ, একজন এনেছে একখানি লাল চেলির শাড়ি।

পাড়ার লোকের আশ্চর্য লাগল। জিজ্ঞাসা করলে, "কে পাঠালেন?" বাহকেরা তার কোনো উত্তর না ক'রে চ'লে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই কুটিরের সম্মুখে এক পাল্‌কি এসে দাঁড়াল। তার মধ্যে থেকে নেমে এলেন কাত্যায়নী ঠাকরুন। উদ্ধব এত সৌভাগ্য স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত

না। কাত্যায়নী বললেন, “দুর্লভ কাল তোমাকে অপমান করেছে, সে কথা তুমি মনে রেখো না। আমি তোমার কন্যাকে আশীর্বাদ ক'রে যাব, তাকে ডেকে দাও।”

কাত্যায়নী নিস্তারিণীকে একগাছি সোনার হার পরিয়ে দিলেন। আর, তার হাতে একশত টাকার একখানি নোট দিয়ে বললেন, “এই তোমার যৌতুক।”

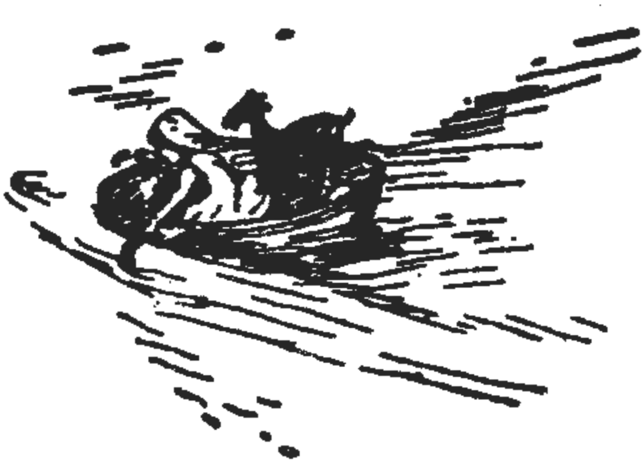

অঞ্জনা-নদী-তীরে চন্দনী গাঁয়ে
পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে
জীর্ণ ফাটল-ধরা— এক কোণে তারি
অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারী।
আত্মীয় কেহ নাই নিকট কী দূর,
আছে এক লেজ-কাটা ভক্ত কুকুর।
আর আছে একতারা, বক্ষেতে ধ'রে
গুন্‌গুন্ গান গায় গুঞ্জন-স্বরে।
গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন
দু-মুঠো অন্ন তারে দুই বেলা দেন।

সাতকড়ি ভঞ্জের মস্ত দালান,
কুঞ্জ সেখানে করে প্রত্যুষে গান।
"হরি হরি" রব উঠে অঙ্গন-মাঝে,
ঝন্‌ঝনি ঝন্‌ঝনি খঞ্জনি বাজে।
ভঞ্জের পিসি তাই সন্তোষ পান,
কুঞ্জকে করেছেন কম্বল দান।
চিঁড়ে মুড়কিতে তার ভরি দেন ঝুলি,
পৌষে খাওয়ান ডেকে মিঠে পিঠে-পুলি।
আশ্বিনে হাট বসে ভারী ধুম ক'রে,
মহাজনি নৌকায় ঘাট যায় ভ'রে;
হাঁকাহাঁকি ঠেলাঠেলি, মহা শোরগোল,
পশ্চিমি মাল্লারা বাজায় মাদোল।
বোঝা নিয়ে মন্থর চলে গোরুগাড়ি,
চাকাগুলো ক্রন্দন করে ডাক ছাড়ি।
কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি—
অন্ধের কণ্ঠের গান আগমনি।

সেই গান মিলে যায় দূর হতে দূরে,
শরতের আকাশেতে সোনা রোদ্‌দুরে॥